পরিপূর্ণ ও সুন্দর জীবন ওদেরও মৌলিক অধিকার

ছোট মেয়ে মঞ্জরী। একমাথা ঝাকড়া চুলে রঙিন ক্লিপ। ছুটোছুটি করছে। উড়ছে ফ্রকের ঘের। সুমনের মুখে সবসময় হাসি। এহসানের চোখে সরল দৃষ্টি। ন্যান্সি একটু চুপচাপ। লুবনা ঠিক তার উল্টো। অনর্গল কথা বলছে, আমাদের বাসায় যেও কিন্তু। আমরা দিলু রোডে থাকি। কাল টেলিভিশন দেখেছ? জানো সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান আর দেখাবো না। কাল ঐ স্কুলের ছেলেরা এসেছিল। ওরা আমার সাথে কথা বলে না, আমি নাকি পাগল।

এরা কেউ পাগল নয়, স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। ফুটফুটে ছেলেমেয়েগুলোকে দেখে আপাতঃদৃষ্টিতে বোঝা যায় না যে এদের কোন অসুবিধা রয়েছে। তবু একথা সত্যি, যে, এদের সবাই বুদ্ধির জড়তা নিয়ে জন্মেছে। শৈশব থেকে বুদ্ধির দৌর্বল্য, বেড়ে ওঠার সময় শ্লথ মানসিক উন্নয়ন শেখার সম্ভাবনার ক্ষীণতা এবং সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে মানিয়ে নেয়ার অক্ষমতা এদের অন্য সবার থেকে আলাদা করে রেখেছে।

এটা চিকিৎসাগত, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা—আসলে একটা বড় ধরনের সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যা বিশ্বব্যাপী। শিল্পোন্নত দেশের জটিল যান্ত্রিক ও গতিশীল জীবন ও ভঙ্গুর সমাজ কাঠামোর কারণে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী। কিন্তু দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা, রোগশোক, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোও এর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এসব দেশের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ লোক পল্লী এলাকায় থাকে, যেখানে চিকিৎসা সুবিধা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেই, থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। পুষ্টিহীনতা, অসুস্থতা ও দারিদ্র্য প্রকট।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৭৫ সালের হিসেব অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বে ৪ কোটি পুরুষ, নারী ও শিশু গুরুতর চিকিৎসা-বঞ্চিত মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে। পৃথিবীর ১০ শতাংশ জনসংখ্যা প্রতিবন্ধী এবং প্রায় ৩ শতাংশ মানসিক স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। বাংলাদেশে এদের সংখ্যা [illegible] ১০ লাখ।

মঞ্জরী, ন্যান্সি, লুবনা, এহসান, কাজল, মাসুম, সুমন, এদের মধ্যে কয়েকজন। তবে এরা কিছুটা ভাগ্যবান, স্কুলে যাবার সুযোগ পেয়েছে। সামান্য হলেও জড়তা কাটিয়ে উঠেছে। প্রাণবন্ত আনন্দঘন পরিবেশে দিনের কিছুটা সময় কাটিয়ে যাচ্ছে।

এজন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য 'দি সোসাইটি ফর দি কেয়ার এ্যাণ্ড এডুকেশন অব মেন্টালী রিটার্ডেড চিলড্রেন'-এর। এই সোসাইটি এ ধরনের শিশুদের জন্য তিনটি স্কুল চালাচ্ছে, মাঝে মাঝে অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করছে, অভিভাবকদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করছে এবং প্রতি শুক্রবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ফ্রি ক্লিনিকের ব্যবস্থা করেছে।

১৯৭৭ সালের শেষদিকে কয়েকজন অভিভাবক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সুলতানা সরওয়ার জামানের উদ্যোগে সোসাইটি গঠিত হয়। স্কুল চালু হয় ১৯৭৮ সালে।

সোসাইটি পরিচালিত স্কুল এতদিন ছিল দুটি—উইলস লিটল হাওয়ার স্কুলের সাথে যৌথভাবে একটি, অন্যটি গার্লস গাইডের সাথে গাইড হাউজ প্রাংগণে। গত ১লা অক্টোবর ধানমণ্ডীতে প্লাসিড টিউটোরিয়ালে শুরু হয়েছে তৃতীয় স্কুলটি। এ ছাড়াও আছে মৌচাকের একটি বস্তির স্কুলের সাথে একটি বিশেষ ক্লাস—দুপুরে দু'ঘন্টা মানসিক স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে।

স্কুলগুলোর অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেছেন মিসেস জাহিরুন্নেসা সাঈদ, যিনি আট বছর লণ্ডনের একটি মানসিক স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের স্কুলে চাকরি করেছেন। স্কুলের শিক্ষকরা যুক্তরাষ্ট্র, নেপাল ও ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। মানসিক স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন দু'জন ছাত্রের মাও এই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। একজন সালমা হক, যার ছেলে এহসানের বয়স ১০ বছর। অন্যজন মমতাজ রহমান তার ছেলে মাসুমের বয়স ১৬।

সোসাইটি পরিচালিত স্কুলগুলোর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৪ জন। ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রী নেয়া হয়। ভর্তির সময় বুদ্ধির পরীক্ষা নেয়া হয়। একজন মনস্তত্ত্ববিদ বিস্তারিত কেস হিষ্টি নেন এবং মেডিক্যাল চেক-আপ করেন একজন মানসিক রোগের চিকিৎসক।

স্কুলে বিশেষ পদ্ধতিতে লেখাপড়া শেখানো হয়। এ ছাড়াও গান, হস্তশিল্প, ছবি আঁকা, শরীর চর্চা ইত্যাদিও শেখানো হয়। মাসে বেতন নেয়া হয় ১০০ টাকা। তবে অবস্থা অনুযায়ী ফি বা হাফ ফি ছাত্র-ছাত্রীও নেয়া হয়। কোন নিয়মিত অনুদান নেই। শিক্ষকদের বেতন দেয়া হয় অভিভাবক ও জনসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে পাওয়া চাঁদা থেকে। ইউনিসেফ অবশ্য বই-খেলনা দিয়ে সাহায্য করছে। বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে ৪০ লাখ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত। এ টাকা পর্যায়ক্রমে দেয়া হবে। প্রাথমিকভাবে জমির জন্য ১০ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে।

মানসিক স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আই কিউ ১৫ থেকে ৭৩। এদের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে ২৭ শতাংশ খুব সামান্য, ৫৬ শতাংশ মাঝারি ও ১৭ শতাংশ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তবে শেষোক্তদের সংখ্যা কমে আসছে। স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকদের অক্লান্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এরা ক্রমে অনেক শান্ত হয়ে এসেছে।

আগেই বলেছি এরা অনেক ভাগ্যবান। বাংলাদেশের কত আনাচে-কানাচে মানসিক, জড়বুদ্ধির মানুষ রয়েছে, যাদের খবর কেউ রাখেনা। ন'কোটি মানুষের দেশ, অনুমান করা হয় মানসিক রোগে ভুগছে ১০ লাখ, কারণ সঠিক সংখ্যা জানা নেই। আর মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ আছেন মাত্র ৯জন। পাবনা মানসিক হাসপাতালে শয্যা আছে ৪শ', অন্যান্য জায়গায় আরো ২শ'। দেশের হাসপাতালগুলোর মাত্র ০'২ শতাংশ শয্যা এদের জন্য বরাদ্দ। প্রতি এক লাখ ৮০ হাজারের জন্য একটি করে। ভারতে আছে প্রতি ৪০ হাজারের জন্য একটি।

সামান্য যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত, যাঁদের জন্য হাসপাতাল নয়—সামান্য যত্ন, সামান্য প্রচেষ্টা দরকার তাঁদের জন্যও কিছু করা হচ্ছে না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশের একটি গ্রামের জরিপে দেখা গেছে প্রতি এক হাজারে ৫৯ জন মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন।

এটি কোন অসুস্থতা নয়, অক্ষমতা। যাঁরা সক্ষম তাদের কর্তব্য এগিয়ে আসা। সরকারের এ ব্যাপারে করবার আছে অনেক। ১০ লাখের মধ্যে মাত্র ৩৪ জনকে নিয়ে সোসাইটি যাত্রা শুরু করেছে। বাকীদের জন্যও কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে।

মানসিক জড়তা এমন কোন রোগ নয় যা ওষুধ বা ইনজেকশন অথবা অস্ত্রোপচারে দূর হবে। এ সমস্যাকে দেখতে হবে অন্যভাবে—ভালবাসা দিয়ে মমতা দিয়ে, যত্ন দিয়ে এদের কাছে টানতে হবে। তবে এরা যেন নিজেদের ভিন্ন না ভাবে এমনভাবে এদের সমাজের মাঝখানে টেনে আনতে হবে। যতটা সম্ভব তাদের সাহায্য করতে হবে। ফুলের মত শিশু এহসান, মঞ্জরী, সুমন, কাজলকে বোঝাতে হবে তারাও আর দশজনের মত এই সমাজের [illegible] তাদেরও যতটা সম্ভব স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ দিতে হবে।

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধীদের জন্য যে অধিকারের ঘোষণা দিয়েছে, তার একটি কথা মানসিক মর্যাদার জন্য সম্মান পাবার স্বাভাবিক অধিকার আছে। তাদের সমবয়সী নাগরিকদের মত তাদেরও একই মৌলিক অধিকার রয়েছে, যার প্রথম ও প্রধানতম হল যতটা সম্ভব পূর্ণ ও স্বাভাবিক সুন্দর জীবন উপভোগের অধিকার। সমাজকে পূর্ণতা দেবার জন্য মানসিক স্বল্পবুদ্ধির মানুষকে এ অধিকারের নিশ্চয়তা দেবার দায়িত্ব আমাদের সবার।

(ডেপথনিউজ, বাংলাদেশ)

সংবাদ ২৮।১১।৮১

110